৪৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা

বিষয়: আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

নমুনা উত্তরপত্র

১) সংক্ষেপে উত্তর দিন: (৪×১০=৪০)

(ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় প্রভাবক বলতে কী বোঝায়? কয়েকটি অ-রাষ্ট্রীয় প্রভাবকের উদাহরণ দিন।

উত্তর - রাষ্ট্রীয় প্রভাবক (State Actors): আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রভাবক বলতে সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহকে বোঝায়, যাদের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, স্থায়ী জনসংখ্যা, কার্যকর সরকার এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি রয়েছে। এই রাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক আইন, কূটনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, সামরিক শক্তি ও অর্থনৈতিক নীতির মাধ্যমে বিশ্ব রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনা করে। উদাহরণ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় প্রভাবক হিসেবে বিবেচিত।

অ-রাষ্ট্রীয় প্রভাবক (Non-State Actors): অ-রাষ্ট্রীয় প্রভাবক হলো রাষ্ট্রের বাইরে অবস্থানকারী এমন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান, যারা সরাসরি সরকার না হয়েও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বিশ্ব রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাব অর্থনৈতিক কার্যক্রম, মানবাধিকার প্রচার, কূটনৈতিক চাপ, জনমত গঠন বা সহিংস কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেও ঘটতে পারে।

অ-রাষ্ট্রীয় প্রভাবকের উদাহরণ

১. আন্তর্জাতিক সংস্থা (International Governmental Organizations – IGOs): রাষ্ট্রসমূহের সমন্বয়ে গঠিত এসব সংস্থা আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণ: জাতিসংঘ (UN), বিশ্বব্যাংক (World Bank), আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)।

২. বহুজাতিক কর্পোরেশন (Multinational Corporations – MNCs): এই কর্পোরেশনগুলো একাধিক দেশে ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে বৈশ্বিক অর্থনীতি, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানে প্রভাব ফেলে। উদাহরণ: কোকা-কোলা, টয়োটা, গুগল।

৩. আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা (Non-Governmental Organizations – NGOs): এগুলো মানবাধিকার, পরিবেশ সংরক্ষণ, ত্রাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক জনমত ও নীতিনির্ধারণে প্রভাব সৃষ্টি করে। উদাহরণ: রেড ক্রস, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, অক্সফাম।

৪. সন্ত্রাসী বা চরমপন্থী গোষ্ঠী: এই গোষ্ঠীগুলো সহিংস কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা, রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা ও বৈশ্বিক রাজনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। উদাহরণ: আল-কায়েদা, আইএস (ISIS)।

৫. ধর্মীয়, জাতিগত গোষ্ঠী ও আন্তর্জাতিক মিডিয়া: ধর্মীয় ও জাতিগত গোষ্ঠী পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতি ও সংঘাতে ভূমিকা রাখে এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়া তথ্য প্রচার ও জনমত গঠনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করে।

খ) জাতিসংঘের কয়টি বিশেষায়িত সংস্থা রয়েছে? World Intellectual Property Organization (WIPO) এর মূল কাজসমূহ কী কী ও এর বাজেটের মূল উৎস কী?

উত্তর - জাতিসংঘের অধিভুক্ত বর্তমানে ১৫টি বিশেষায়িত সংস্থা (Specialized Agencies) রয়েছে। এই সংস্থাগুলো অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শ্রম, যোগাযোগ, শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য ও মেধাস্বত্বসহ বিভিন্ন বৈশ্বিক ক্ষেত্রে কাজ করে।

World Intellectual Property Organization (WIPO): বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থা (World Intellectual Property Organization – WIPO) জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা, যা বিশ্বব্যাপী মেধাস্বত্ব (Intellectual Property – IP) সুরক্ষা, উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতা উন্নয়নে কাজ করে।

WIPO-এর মূল কাজসমূহ

১. মেধাস্বত্ব সুরক্ষা: WIPO উদ্ভাবক, স্রষ্টা ও উদ্যোক্তাদের মেধাসম্পদ—যেমন পেটেন্ট, কপিরাইট, ট্রেডমার্ক ও শিল্পনকশা—সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রদান করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কপিরাইট আইন দ্বারা সংরক্ষিত।
Live Written™ অ্যাপ, সাইট কিংবা লেকচার কোন অংশ নকল করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
© CrackTech

২. আন্তর্জাতিক আইপি সেবা প্রদান: WIPO পেটেন্ট সহযোগিতা চুক্তি (PCT), মাদ্রিদ সিস্টেম (ট্রেডমার্ক) এবং হেগ সিস্টেম (শিল্প ডিজাইন) পরিচালনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজতর করে।

৩. আন্তর্জাতিক নীতি ও আইন প্রণয়ন: বিশ্বব্যাপী মেধাস্বত্ব আইন ও নীতির সমন্বয় সাধনের জন্য WIPO বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি, কনভেনশন ও নীতিগত কাঠামো তৈরি ও উন্নয়ন করে।

৪. বিরোধ নিষ্পত্তি সহায়তা: WIPO Arbitration and Mediation Center-এর মাধ্যমে মেধাস্বত্বসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে মধ্যস্থতা ও সালিশি সহায়তা প্রদান করে।

৫. সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি: সদস্য রাষ্ট্রসমূহে উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতা উৎসাহিত করতে WIPO প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা ও নীতিগত পরামর্শ প্রদান করে।

WIPO-এর বাজেটের মূল উৎস: স্বনির্ভর অর্থায়ন ব্যবস্থা: WIPO একটি ব্যতিক্রমধর্মী জাতিসংঘ সংস্থা, কারণ এটি তার বাজেটের ৯০%-এরও বেশি অর্থ নিজস্ব ফি-ভিত্তিক সেবা (Fee-for-service) থেকে অর্জন করে।

- পেটেন্ট সহযোগিতা চুক্তি (PCT) থেকে প্রাপ্ত ফি।
- মাদ্রিদ সিস্টেম (আন্তর্জাতিক ট্রেডমার্ক নিবন্ধন) থেকে প্রাপ্ত ফি।
- হেগ সিস্টেম (শিল্প ডিজাইন নিবন্ধন) থেকে প্রাপ্ত ফি।

(গ) অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ (Economic Nationalism) বলতে কী বোঝায়? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর - অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ (Economic Nationalism) হলো এমন একটি অর্থনৈতিক মতাদর্শ ও নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে বিশ্বায়ন ও অবাধ বাণিজ্যের পরিবর্তে নিজস্ব দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ, দেশীয় শিল্প, উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এই নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো বিদেশী প্রতিযোগিতা থেকে দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা দেওয়া, জাতীয় অর্থনীতিকে স্বনির্ভর করা এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ বিদেশী পুঁজি, পণ্য ও সেবার অবাধ প্রবাহের বিষয়ে সতর্ক বা সন্দিহান থাকে। এ নীতিতে সরকার আমদানি শুল্ক (Tariffs), কোটা (Quotas), ভর্তুকি (Subsidies) ও বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ শিল্প ও উৎপাদন খাতকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ মূলত অর্থনৈতিক উদারতাবাদ (Economic Liberalism) বা মুক্তবাণিজ্য নীতির বিপরীত অবস্থানে অবস্থান করে এবং জাতীয় স্বার্থকে বৈশ্বিক বাজারের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়।

উদাহরণ

১. আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি: কোনো রাষ্ট্র বিদেশী স্টিল বা কৃষিপণ্যের ওপর উচ্চ শুল্ক আরোপ করে, যাতে দেশীয় কারখানা ও উৎপাদকরা বিদেশী প্রতিযোগিতার চাপ থেকে রক্ষা পায় এবং স্থানীয় কর্মসংস্থান বজায় থাকে।

২. স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের নীতি: যুক্তরাষ্ট্রের 'আমেরিকান ফার্স্ট' নীতির মাধ্যমে দেশীয় উৎপাদন ও পণ্যের ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হয় এবং বিদেশী পণ্যের ওপর নির্ভরতা কমানোর চেষ্টা করা হয়।

৩. মুদ্রা ও পুঁজির ওপর নিয়ন্ত্রণ: ১৯৯৭ সালের এশীয় আর্থিক সংকটের সময় মালয়েশিয়া বিদেশী পুঁজির অনিয়ন্ত্রিত প্রবাহ রোধে মুদ্রা ও পুঁজিবাজারের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, যা অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের একটি বাস্তব উদাহরণ।

(ঘ) জনকূটনীতির (Public Diplomacy) সংজ্ঞা দিন। জনকূটনীতির উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর - জনকূটনীতি (Public Diplomacy) হলো এমন একটি কূটনৈতিক কৌশল, যেখানে কোনো রাষ্ট্রের সরকার সরাসরি অন্য দেশের সাধারণ জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে নিজস্ব সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, আদর্শ ও নীতিগত অবস্থান তুলে ধরে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিদেশি জনমত প্রভাবিত করা, পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি করা এবং সফট পাওয়ার (Soft Power) বা আকর্ষণশক্তি সম্প্রসারণ করাই জনকূটনীতির মূল লক্ষ্য।

জনকূটনীতির উদ্দেশ্য

১. বিদেশি জনমত প্রভাবিত করা: অন্য দেশের জনগণের চিন্তা, ধারণা ও মনোভাবকে প্রভাবিত করে নিজ রাষ্ট্রের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা জনকূটনীতির একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কপিরাইট আইন দ্বারা সংরক্ষিত।
Live Written™ অ্যাপ, সাইট কিংবা লেকচার কোন অংশ নকল করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
© CrackTech

২. সফট পাওয়ার বৃদ্ধি: সংস্কৃতি, শিক্ষা, মূল্যবোধ ও আদর্শের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে রাষ্ট্রের গ্রহণযোগ্যতা, জনপ্রিয়তা ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করা।

৩. পারস্পরিক বোঝাপড়া ও বিশ্বাস গড়ে তোলা: রাষ্ট্রসমূহের জনগণের মধ্যে বিদ্যমান ভুল বোঝাবুঝি দূর করে দীর্ঘমেয়াদি বিশ্বাস ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা।

৪. পররাষ্ট্রনীতির প্রতি সমর্থন আদায়: নিজ দেশের পররাষ্ট্রনীতি, কূটনৈতিক অবস্থান ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহকে আন্তর্জাতিকভাবে বৈধ, গ্রহণযোগ্য ও সমর্থিত করে তোলা।

জনকূটনীতির পদ্ধতিসমূহ

১. সাংস্কৃতিক কূটনীতি (Cultural Diplomacy): শিল্প, সংগীত, চলচ্চিত্র, সাহিত্য, ভাষা ও সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিশ্বদরবারে উপস্থাপন করা।

২. বিনিময় কর্মসূচি (Exchange Programs): শিক্ষার্থী, শিক্ষক, গবেষক ও পেশাজীবীদের বিনিময়ের মাধ্যমে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান জোরদার করা।

৩. আন্তর্জাতিক সম্প্রচার ও গণমাধ্যম (International Broadcasting & Media): বিবিসি, সিএনএন বা রাষ্ট্রীয় আন্তর্জাতিক সম্প্রচারমাধ্যমের মাধ্যমে বৈশ্বিক পরিসরে তথ্য, সংবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করা।

৪. ডিজিটাল কূটনীতি (Digital Diplomacy): সোশ্যাল মিডিয়া, ওয়েবসাইট ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সরাসরি বিদেশি জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা।

৫. শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম (Education & Research): স্কলারশিপ প্রদান, ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে দীর্ঘমেয়াদি সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পর্ক গড়ে তোলা (যেমন - ব্রিটিশ কাউন্সিল, গ্যোটে ইনস্টিটিউট)।

(ঙ) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে "Liberal Institutionalism" "Traditional Liberalism" এর মূল পার্থক্যগুলো আলোচনা করুন।

উত্তর - Traditional Liberalism (ঐতিহ্যগত উদারনীতিবাদ): এটি একটি রাজনৈতিক ও দার্শনিক মতাদর্শ, যা মানুষের যৌক্তিকতা, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও বাণিজ্যের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি এবং ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেয়।

Liberal Institutionalism (নব্য-উদারনীতিবাদী প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদ): এটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক স্বার্থ এবং সহযোগিতাকে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, নিয়ম ও কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালনা করার কৌশলগত উপায় ব্যাখ্যা করে।

দিক	Traditional Liberalism	Liberal Institutionalism
দৃষ্টিভঙ্গি ও কাজের ক্ষেত্র	রাজনৈতিক দর্শন ও মানবতার বিকাশে বিশ্বাসী; মানুষের যৌক্তিকতা ও স্বাধীনতার ওপর জোর দেয়।	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, নিয়ম, বাণিজ্য এবং কৌশলগত পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রধানভাবে গুরুত্ব দেয়।
সহযোগিতার মাধ্যম	গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও অবাধ বাণিজ্যই আন্তর্জাতিক শান্তির মূল ভিত্তি ধরা হয়।	রাষ্ট্র স্বার্থপর হলেও আন্তর্জাতিক সংস্থা (যেমন: জাতিসংঘ, WTO) এবং নিয়মিত পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সহযোগিতা সম্ভব।
রাষ্ট্রের ভূমিকা	রাষ্ট্রকে উদার ও নৈতিক আচরণের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার অঙ্গ হিসেবে দেখা হয়।	রাষ্ট্রকে স্বার্থপর ও নৈরাজ্যিক মানে দেখলেও, প্রতিষ্ঠান ও নিয়মের মাধ্যমে সহযোগিতা সম্ভব বলে ধরা হয়।
লক্ষ্য	আদর্শভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, যেখানে মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত থাকে।	স্থিতিশীল, স্বচ্ছ এবং ঝুঁকি কমানো আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, যেখানে পারস্পরিক লেনদেন ও যোগাযোগের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন করা যায়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কপিরাইট আইন দ্বারা সংরক্ষিত।
Live Written™ অ্যাপ, সাইট কিংবা লেকচার কোন অংশ নকল করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
© CrackTech

(চ) আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থায় "Impossible Trinity" বা "Unholy Trinity" বলতে কী বোঝায়?

উত্তর - Impossible Trinity বা Unholy Trinity হলো আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে কোনো দেশ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারে না। অর্থাৎ, দেশগুলো একসাথে স্বাধীন মুদ্রানীতি, স্থির বিনিময় হার এবং অবাধ পুঁজির প্রবাহ এই তিনটি লক্ষ্য একসাথে পূর্ণ করতে পারে না। তাই দেশগুলোর কাছে মূল সিদ্ধান্ত হলো কোন দুটি নীতি তারা প্রধান্য দেবে এবং কোন নীতি ত্যাগ করবে। এই ধারণা আন্তর্জাতিক আর্থিক নীতি, মুদ্রানীতি এবং বিনিয়োগ নীতি প্রণয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মূল ধারণা - ১৯৬০-এর দশকে অর্থনীতিবিদ রবার্ট মুন্ডেল (Robert Mundell) এবং মার্কাস ফ্লেমিং (Marcus Fleming) এই তত্ত্ব প্রবর্তন করেন। তারা দেখান যে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি একাধিক লক্ষ্য একসাথে পূরণ করতে দেয় না, এবং দেশগুলোকে তাদের প্রাধান্য অনুসারে দুইটির মধ্যে বেছে নিতে হয়। এটি আন্তর্জাতিক আর্থিক নীতি তৈরিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা হিসেবে বিবেচিত। উদাহরণস্বরূপ, ইউরোজোনের দেশগুলো স্থির বিনিময় হার ও অবাধ পুঁজির প্রবাহ বেছে নিয়েছে, কিন্তু স্বাধীন মুদ্রানীতি হারিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন মুদ্রানীতি ও অবাধ পুঁজির প্রবাহ বেছে নিয়েছে, ফলে তাদের বিনিময় হার ভাসমান। অন্যদিকে, চীন স্থির বিনিময় হার ও স্বাধীন মুদ্রানীতি বেছে নিয়েছে, তাই তাদের পুঁজির প্রবাহ সীমিত রাখা হয়েছে।

ছ) "Ethnic Conflict" ও "Interstate Conflict"- এ দুই ধরনের সংঘাত সংজ্ঞায়িত করুন।

উত্তর - জাতিগত সংঘাত (Ethnic Conflict) হলো একটি দেশের অভ্যন্তরে দুই বা ততোধিক জাতিগত, ভাষাগত বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতা, সম্পদ বা পরিচয়ের দ্বন্দ্ব থেকে সৃষ্ট সহিংসতা। এটি সাধারণত দেশের অভ্যন্তরীণ সীমার মধ্যে (Intra-state) সংঘটিত হয় এবং জাতিগোষ্ঠীগুলো নিজেদের সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অবস্থান শক্তিশালী করতে বা বৈষম্যের প্রতিবাদে লড়াই করে। যদিও এটি অভ্যন্তরীণ ঘটনা, তবুও কখনো কখনো এর আন্তর্জাতিক মাত্রা বা প্রভাবও থাকতে পারে। উদাহরণ হিসেবে ইতিহাসে রুয়ান্ডার গণহত্যা এবং যুগোস্লাভিয়ার গৃহযুদ্ধ জাতিগত সংঘাতের সুপরিচিত।

অপরদিকে, ইন্টারস্টেট সংঘাত (Interstate Conflict) হলো দুটি বা ততোধিক সার্বভৌম রাষ্ট্র বা দেশের সরকারের মধ্যে সরাসরি সামরিক সংঘাত বা যুদ্ধ। এটি সাধারণত আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে ঘটে এবং মূলত সীমান্ত বিরোধ, ভূ-রাজনৈতিক দখল, প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ বা পারস্পরিক শত্রুতা থেকে উদ্ভূত হয়। উদাহরণ হিসেবে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এবং রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতকে উল্লেখ করা যায়।

জ) জলবায়ু পরিবর্তন সংকট বৈশ্বিক অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থায় কী ধরনের পরিবর্তন আনছে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর - জলবায়ু পরিবর্তন সংকট বৈশ্বিক অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনছে। এটি সরবরাহ চেইনকে (supply chain) বিঘ্নিত করছে, কৃষিতে উৎপাদনশীলতা কমাচ্ছে এবং খাদ্যের দাম বাড়াচ্ছে। সেই সঙ্গে এটি সবুজ জ্বালানি ও টেকসই প্রযুক্তির দিকে বিনিয়োগ স্থানান্তরের জন্য দেশগুলোকে বাধ্য করছে। উৎপাদন খাতে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের চাপ এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে উপকূলীয় অবকাঠামোর ঝুঁকি তৈরি হওয়ায় দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বৈশ্বিক অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রধান পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ:

প্রথমত, উৎপাদন ও সরবরাহ শৃঙ্খল বিঘ্নিত হচ্ছে। চরম আবহাওয়ার কারণে যেমন খরা, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় কাঁচামাল সরবরাহ এবং পরিবহন ব্যবস্থাকে ব্যাহত করছে, যা শিল্প উৎপাদনকে প্রভাবিত করছে।

দ্বিতীয়ত, কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনে ধস দেখা দিচ্ছে। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি এবং মরুভূমিকরণের কারণে উর্বর জমির পরিমাণ কমছে, যার ফলে বিশ্বজুড়ে খাদ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে এবং খাদ্য নিরাপত্তা সংকট তৈরি হচ্ছে।

তৃতীয়ত, সবুজ অর্থনীতিতে রূপান্তর ঘটছে। কার্বন নিঃসরণ কমানোর বৈশ্বিক চাপে কয়লা বা জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক শিল্পগুলো অলাভজনক ('stranded assets') হয়ে পড়ছে। এর বিপরীতে, নবায়নযোগ্য শক্তি, বৈদ্যুতিক যানবাহন এবং টেকসই প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চতুর্থত, শ্রম উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে। প্রচণ্ড তাপদাহ এবং জলবায়ুর চরম অবস্থার কারণে বাইরে কাজ করা শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা কমে যাচ্ছে, যা নির্মাণ, কৃষি ও অন্যান্য খাতে প্রভাব ফেলছে।

পঞ্চমত, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল দেশগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যা দরিদ্র দেশগুলোতে দুর্ভিক্ষ, অভ্যন্তরীণ অভিবাসন এবং সামাজিক অস্থিতিশীলতার ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কপিরাইট আইন দ্বারা সংরক্ষিত।
Live Written™ অ্যাপ, সাইট কিংবা লেকচার কোন অংশ নকল করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
© CrackTech

শেষে, বীমা ও আর্থিক খাত প্রভাবিত হচ্ছে। দুর্যোগের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় বীমা কোম্পানিগুলোর ঝুঁকি এবং প্রিমিয়ামের খরচ বাড়ছে, যা সামগ্রিক আর্থিক খাতকে অস্থিতিশীল করছে।

(ঝ) 'আসিয়ান ওয়ে' ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর - 'আসিয়ান ওয়েই' (ASEAN Way) হলো দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জাতীয় সংস্থা ASEAN এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্ক, কূটনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি স্বতন্ত্র এবং অনানুষ্ঠানিক ধারা। এটি মূলত সদস্য দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব রক্ষা, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ এড়ানো, শান্তিপূর্ণ বিরোধ নিষ্পত্তি এবং ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

আসিয়ান ওয়েই-এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো –

১. অ-হস্তক্ষেপ নীতি (Non-interference): সদস্য রাষ্ট্রগুলো একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না এবং প্রতিটি দেশের সার্বভৌমত্বকে সর্বোচ্চ সম্মান জানায়।

২. শান্তিপূর্ণ সমাধান ও ঐকমত্য (Consensus & Peaceful Settlement): যেকোনো বিরোধ বা ইস্যু আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সব সদস্যের সম্মতি বা ঐকমত্যের ভিত্তিতে।

৩. নীরব কূটনীতি (Quiet Diplomacy): সমস্যা বা বিরোধ প্রকাশ্যে সমাধানের বদলে, পর্দার আড়ালে বা নীরব আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হয়।

৪. সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা: সদস্য রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীনতা ও সমতার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৫. সামরিক শক্তির ব্যবহার না করা: কোনো বিরোধে শক্তি প্রয়োগের বদলে সংলাপ ও কূটনীতিক সমাধানকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

এই নীতিমালা আসিয়ান ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও আঞ্চলিক সহযোগিতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা, যা ভিন্ন মতাদর্শ, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দেশগুলোকে এক প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত করেছে। তবে, অনেক ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সংকট নিরসনের ক্ষেত্রে ঐকমত্য প্রক্রিয়ার ধীরগতি সমালোচিত হয়ে থাকে।

(ঞ) ২০২১ সালে সংঘটিত সামরিক অভ্যুত্থান মিয়ানমারের অভ্যন্তরীন রাজনীতিতে কী পরিবর্তন এসেছে? এক্ষেত্রে পশ্চিমা বিশ্বসহ কয়েকটি আঞ্চলিক বৃহৎ শক্তির ভূমিকা কী?

উত্তর - ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে মিয়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে গণতান্ত্রিক শাসনের কবর রচিত হয় এবং দেশটি এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ ও রক্তক্ষয়ী সংঘাতের দিকে ধাবিত হয়। সামরিক জান্তা NLD সরকার উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করলে ব্যাপক বিক্ষোভ এবং অসহযোগ আন্দোলন (CDM) শুরু হয়। সাধারণ মানুষ ও তরুণরা PDF (People's Defence Forces) গঠন করে এবং জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর (EAOs) সাথে মিলে জান্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। এর ফলে সামরিক জান্তার নিয়ন্ত্রণ পুরো দেশে দুর্বল হয়ে পড়ে, অনেক অঞ্চলে তারা প্রতিরোধ বাহিনীর আক্রমণের মুখে পিছিয়ে যায়। পাশাপাশি অর্থনৈতিক ধস, ব্যাপক বাস্তুচ্যুতি এবং মানবিক পরিস্থিতির ভয়াবহ অবনতি ঘটে। এই পরিস্থিতিতে নতুন রাজনৈতিক শক্তি ও সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর প্রভাব বৃদ্ধি পায়, যা দেশের রাজনীতিতে পুরনো ধাঁচের রাজনৈতিক দলের অবস্থানকে সংকুচিত করেছে।

আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর ভূমিকা এ প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়। চীন জান্তাকে স্থিতিশীল রাখার জন্য সমর্থন প্রদান করছে, বিশেষ করে বাণিজ্যিক ও কৌশলগত স্বার্থের কারণে। একই সঙ্গে জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সাথেও যোগাযোগ রাখার ফলে চীনকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দেখা যায়। রাশিয়া জান্তার প্রধান সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহকারী হিসেবে অব্যাহত রয়েছে, যা জান্তার আকাশপথে হামলা এবং সামরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে সাহায্য করছে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশগুলো সামরিক অভ্যুত্থানকে তীব্রভাবে নিন্দা জানিয়ে কঠোর অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এবং গণতান্ত্রিক শক্তিকে সমর্থন করার কথা বলছে। আসিয়ান (ASEAN) ৫-দফা শান্তি পরিকল্পনা প্রণয়ন করলেও জান্তা তা বাস্তবায়ন না করায় কার্যকর ভূমিকা খতে পারেনি।

পরিশেষে বলা যায় যে, ২০২১ সালের সামরিক অভ্যুত্থান মিয়ানমারকে দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তক্ষয়ী সংঘাতের দিকে ঠেলে দিয়েছে, যা দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য একটি বড় হুমকি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কপিরাইট আইন দ্বারা সংরক্ষিত।
Live Written™ অ্যাপ, সাইট কিংবা লেকচার কোন অংশ নকল করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
© CrackTech

২। যথাযথ তথ্য উপাত্ত ও উদাহরণ ব্যবহার করে নিম্নবর্ণিত বিশ্লেষণাত্মক প্রশ্নসমূহের উত্তর লিপিবদ্ধ করুন: (৩×১৫=৪৫)

(ক) খাদ্য ও জ্বালানী নিরাপত্তা (Food and Energy Securities) বর্তমান বৈশ্বিক রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। চলমান যুদ্ধ ও সংঘাতের বৈশ্বিক অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ খাদ্য ও জ্বালানী নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে?

উত্তর - খাদ্য ও জ্বালানী নিরাপত্তা (Food and Energy Security) বর্তমান বৈশ্বিক রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। চলমান যুদ্ধ, সংঘাত এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে এই নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৌশলগতভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। বিশেষত খাদ্য ও জ্বালানি সরবরাহে একক উৎসে নির্ভরতা ঝুঁকি বাড়ায়, যা সরবরাহ শৃঙ্খল বিপর্যয় এবং মূল্যবৃদ্ধির মতো সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং, বাংলাদেশকে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি, আমদানির উৎস বৈচিত্র্যকরণ এবং কৌশলগত মজুত সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশ যে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তা হলো -

১. আমদানি নির্ভরতা কমানো ও অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মতো পরিস্থিতিতে খাদ্য ও জ্বালানির সরবরাহ শৃঙ্খল ভেঙে পড়েছিল। তাই নিত্যপণ্য যেমন চাল, গম এবং জ্বালানির জন্য নির্দিষ্ট একটি উৎসের ওপর নির্ভর না করে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। এটি সরবরাহ শৃঙ্খলকে স্থিতিশীল রাখতে এবং বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলায় সহায়ক হবে।

২. কৌশলগত মজুত (Strategic Reserves) তৈরি: সংকটকালে দ্রুত মূল্যবৃদ্ধি ও ঘাটতি মোকাবিলার জন্য খাদ্য ও জ্বালানির বড় ধরনের মজুত বা বাফার স্টক নিশ্চিত করতে হবে। এটি জাতীয় সুরক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৩. জ্বালানি বৈচিত্র্যকরণ: একক জ্বালানি উৎসের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে বিভিন্ন উৎস ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এর মধ্যে কয়লা, পরমাণু বিদ্যুৎ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি যেমন সৌর ও বায়ু শক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

৪. কৃষিতে জলবায়ু-সহিষ্ণু প্রযুক্তি গ্রহণ: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বন্যা, খরা ও অনিয়মিত আবহাওয়া খাদ্য উৎপাদনে ঝুঁকি তৈরি করে। তাই জলবায়ু-সহিষ্ণু শস্য জাত উদ্ভাবন এবং উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এটি খাদ্য নিরাপত্তাকে দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীল রাখবে।

৫. নিত্যপণ্যের সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা: ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহ এবং নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী শক্তিশালী করার জন্য টিসিবি বা অনুরূপ রাষ্ট্রীয় সংস্থার মাধ্যমে কার্যকর বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা জরুরি।

সর্বোপরি, খাদ্য ও জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশকে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, বৈচিত্র্যময় জ্বালানি নীতি, জলবায়ু-সহিষ্ণু কৃষি ও কৌশলগত মজুত—এই চারটি দিককে সমন্বিতভাবে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এভাবে দেশ বৈশ্বিক সংঘাত ও অস্থিরতা থেকে উদ্ভূত ঝুঁকি মোকাবিলা করতে পারবে এবং স্থিতিশীল অর্থনীতি ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

(খ) ১৯৭০ এর দশক থেকে গড়ে ওঠা চীন-মার্কিন সম্পর্ক এবং সাম্প্রতিক সময়ে এ সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আপনার বিশ্লেষণ পেশ করুন।

উত্তর - ১৯৭০-এর দশকে চীন-মার্কিন সম্পর্কের সূচনা হয়েছিল প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের চীন সফরের মাধ্যমে, যা বিশ্ব রাজনীতিতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন হিসেবে ধরা হয়। দীর্ঘসময় ধরে চলা সিনো-আমেরিকান বরফ গলা এই সফরের মাধ্যমে সম্ভব হয় এবং দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক যোগাযোগ পুনঃস্থাপনের পথ সুগম হয়। ১৯৭২ সালের সাংহাই ইস্তাহার এই সম্পর্কের মূল কাঠামো স্থাপন করে। এখানে উভয় দেশ কিছু মূল নীতিতে ঐকমত্য স্থাপন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক ও কৌশলগত প্রভাব মোকাবিলা করা এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মাধ্যমে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। এরপর, ১ জানুয়ারি ১৯৭৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রদূত পর্যায়ের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক তৈরি করা, রাজনৈতিক বৈষম্য কমানো এবং আন্তর্জাতিক ক্ষমতা ভারসাম্য রক্ষা করা।

১৯৮০-৯০-এর দশক ও চীনের আর্থিক উত্থান:

নব্বইয়ের দশকে চীনের ডব্লিউটিও (WTO) তে যোগদান এবং দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের সম্পর্ককে নতুন মাত্রা দেয়। বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পেলেও, একই সময়ে চীনের বিশ্ববাজারে অভ্যুত্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে। অর্থনৈতিক নির্ভরতা বাড়লেও, প্রযুক্তি, উৎপাদন ক্ষমতা এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ নিয়ে নতুন দ্বন্দ্বের সূচনা হয়।

© CrackTech
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কপিরাইট আইন দ্বারা সংরক্ষিত।
Live Written™ অ্যাপ, সাইট কিংবা লেকচার কোন অংশ নকল করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সাম্প্রতিক সময়ে সম্পর্কের গতি ও প্রকৃতি:

বর্তমানে চীন-মার্কিন সম্পর্ককে প্রধানত কৌশলগত প্রতিযোগিতা, আস্থার সংকট এবং আঞ্চলিক উত্তেজনা দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের সময় শুরু হওয়া বাণিজ্যযুদ্ধ এবং শুল্ক, সেমিকন্ডাক্টর, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও প্রযুক্তি খাতে কঠোর বিধিনিষেধ বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের পাশাপাশি প্রযুক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হয়েছে।

তাইওয়ান ও দক্ষিণ চীন সাগর: চীনের কঠোর অবস্থান তাইওয়ান ইস্যুতে এবং দক্ষিণ চীন সাগরে আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা উভয় দেশের মধ্যে সামরিক ও কৌশলগত উত্তেজনা বৃদ্ধি করেছে। যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানকে সমর্থন এবং দক্ষিণ চীন সাগরে নৌ চলাচল বজায় রাখার মাধ্যমে চীনের আধিপত্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে।

ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা: চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI) যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত হুমকি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। চীন এই প্রজেক্টের মাধ্যমে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব সীমিত করতে পারে।

আস্থাহীনতা ও দ্বিপাক্ষিক অনিশ্চয়তা: কোভিড-১৯ মহামারি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, মানবাধিকার ইস্যু এবং বাণিজ্যিক দ্বন্দ্ব চীন-মার্কিন সম্পর্ককে প্রায় আস্থাহীনতার পর্যায়ে নিয়ে গেছে। অনেক বিশ্লেষক এই পরিস্থিতিকে একটি নতুন "শীতল যুদ্ধ" হিসেবে বর্ণনা করছেন, যেখানে উভয় দেশ কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে যাচ্ছে, তবে সরাসরি যুদ্ধের দিকে যাচ্ছে না।

পরিশেষে বলা যায় যে, চীন-মার্কিন সম্পর্কের শুরু ছিল কৌশলগত সহযোগিতা, বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির ওপর। তবে বর্তমানে তা কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রযুক্তি যুদ্ধ, ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত এবং আস্থার সংকটের জটিল নেটওয়ার্কে পরিণত হয়েছে। বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় থাকলেও, দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা সংকুচিত হয়েছে এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন আকারের শীতল প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে উঠেছে।

(গ) ব্রাজিলের বেলেম- এ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত COP-30 সম্মেলনের অর্জনসমূহের সার-সংক্ষেপ বর্ণনা ও মূল্যায়ন করুন। বিশ্ব বাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলো জলবায়ু সমস্যা সমাধান বিষয়ক আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সংলাপকে কেন ও কীভাবে প্রভাবিত করে?

উত্তর - ব্রাজিলের বেলেমে ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত COP-30 সম্মেলন জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবেলায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সম্মেলনের অন্যতম মূল অর্জন হলো জলবায়ু অভিযোজন অর্থায়ন তিনগুণ বৃদ্ধি করা, যা ২০৩৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলোকে জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় অর্থায়ন নিশ্চিত করা হবে।

দ্বিতীয়ত, 'ট্রপিক্যাল ফরেস্ট ফরেভার ফ্যাসিলিটি' চালু করা হয়েছে, যা বিশ্বের ট্রপিক্যাল বনাঞ্চল, বিশেষ করে আমাজন বন সংরক্ষণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। এটি বনায়ন ও বায়বীয় ভারসাম্য রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

তৃতীয়ত, কার্বন মার্কেট ও টেকসই বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য একটি 'ওপেন কোয়ালিশন' গঠিত হয়েছে। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কার্বন প্রাইসিং এবং কার্যকর কার্বন বাজারের কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হবে, যা গ্লোবাল কার্বন নির্গমন কমাতে সহায়ক।

চতুর্থত, সম্মেলনে আদিবাসী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণকে বিশেষভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রথমবারের মতো আদিবাসীদের ভূমিকা জলবায়ু কর্মপরিকল্পনার নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা স্থানীয় সমর্থন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি বাস্তবায়নে সহায়ক।

মূল্যায়ন - COP-30-এর অর্জন সত্ত্বেও কিছু সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। প্রথমত, জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসার চূড়ান্ত বা বাধ্যতামূলক রোডম্যাপের অভাব রয়েছে। এর ফলে উষ্ণতা 1.5°C সীমাবদ্ধ রাখার লক্ষ্য অর্জনে সন্দেহ রয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, অর্থায়নের ধীরগতি লক্ষ্য অর্জনে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়েছে। উন্নত দেশগুলোর প্রতিশ্রুত আর্থিক সহায়তা এখনো কার্যকরভাবে নিশ্চিত হয়নি। তৃতীয়ত, সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলো 'অ্যাকশন-ভিত্তিক' হলেও রাজনৈতিক মতপার্থক্য, দীর্ঘসূত্রিতা এবং বাস্তবায়নের জটিলতা এখনও বড় বাধা। অর্থাৎ, COP-30 কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন পর্যায়ে পৌঁছাতে হলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, অর্থায়ন এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর নিশ্চিত করতে হবে।

বিশ্ব বাণিজ্যের প্রভাব জলবায়ু সংলাপে

১. কার্বন সীমান্ত সমন্বয় (CBAM): ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশ 'কার্বন বর্ডার অ্যাডজাস্টমেন্ট মেকানিজম' চালু করেছে, যার মাধ্যমে বাণিজ্যের ওপর কার্বন শুল্ক আরোপ করা হয়। এটি বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলোর রপ্তানি পণ্যের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে এবং জলবায়ু নীতিতে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করে।

২. সবুজ প্রযুক্তি ও বাণিজ্য: কম কার্বনযুক্ত প্রযুক্তির বৈশ্বিক বাণিজ্য জলবায়ু পরিবর্তন কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে প্রযুক্তি মালিকানা, পেটেন্ট এবং বাণিজ্যিক শর্তাবলী উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে মতবিরোধ ও আলোচনাকে প্রভাবিত করে।

© CrackTech
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কপিরাইট আইন দ্বারা সংরক্ষিত।
Live Written™ অ্যাপ, সাইট কিংবা লেকচার কোন অংশ নকল করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৩. শুল্ক ও নীতি: বাণিজ্য নীতিমালা, যেমন শুল্ক বা ভর্তুকি, জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ওপর প্রভাব ফেলে। সঠিক নীতি গ্রহণ করলে নবায়নযোগ্য শক্তির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং কার্বন নির্গমন হ্রাস পায়।

৪. বন উজাড় ও পণ্য বাণিজ্য: আমাজনের মতো বনাঞ্চল ধ্বংস করে উৎপাদিত পণ্য (যেমন সয়াবিন, গরুর মাংস) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিষেধাজ্ঞা বা বিধিনিষেধের মুখোমুখি হয়। এটি সরাসরি জলবায়ু নীতি এবং কূটনীতিকে প্রভাবিত করে।

সব শেষে বলা যায় যে COP-30 সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ অর্জন যেমন অভিযোজন অর্থায়ন, বন সংরক্ষণ, কার্বন মার্কেট এবং স্থানীয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, তবে বাস্তবায়ন ও বাধ্যতামূলক রোডম্যাপের অভাবে ফলাফল মিশ্র ও সীমিত। বিশ্ব বাণিজ্য জলবায়ু আলোচনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শুল্ক, রপ্তানি বিধিনিষেধ, কার্বন সীমান্ত ব্যবস্থা, প্রযুক্তি বাণিজ্য ও বন উজাড়ের নিয়ন্ত্রণ সবই আন্তর্জাতিক জলবায়ু নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। অর্থাৎ, জলবায়ু সংকট মোকাবিলার জন্য বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক নীতির সঙ্গে সুবিন্যস্ত সমন্বয় অপরিহার্য।

৩। সমস্যা সমাধানমূলক প্রশ্নগুলোর (Problem Solving Questions) উত্তর দিন: (১× ১৫=১৫)

জলবায়ু পরিবর্তনের সম্মুখসারির দেশ হিসেবে বাংলাদেশ অর্থ ও প্রযুক্তি সহায়তার জন্য আন্তর্জাতিক মহলের ওপর নির্ভরশীল, যা প্রায়শই শর্তযুক্ত এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সাংঘর্ষিক। এই পরিস্থিতি মোকাবেলায়, দীর্ঘমেয়াদী 'ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্ল্যান' (২০২২-২০৪১) অনুসরণ করে জলবায়ু অভিযোজন ও উন্নয়নকে সমন্বিত করতে হবে । শর্তযুক্ত সহায়তা গ্রহণে দেশের স্বার্থ রক্ষা, প্রযুক্তি হস্তান্তরে গুরুত্ব, নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্বচ্ছ নিরীক্ষা নিশ্চিত করাই হবে প্রধান কৌশল ।

(ক) অভিযোজন নীতি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির দ্বন্দ্ব সমাধান:

জলবায়ু অভিযোজন কৌশল এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে একীভূত করতে, উন্নয়ন পরিকল্পনার (যেমন- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) সঙ্গে অভিযোজন নীতিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এখানে 'গ্রিন গ্রোথ' বা পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের দিকে ধাবিত হওয়া জরুরি, যেখানে অবকাঠামো নির্মাণে (যেমন- সড়ক, বাঁধ) জলবায়ু সহনশীল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। পাশাপাশি, অভিযোজন প্রচেষ্টাকে স্থানীয় কর্মসংস্থান এবং গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে, যেন এটি স্থানীয় জনগণের জীবনমান উন্নয়নের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়।

(খ) রাজনৈতিক চাপ ও কৌশলগত ঝুঁকি মোকাবেলা:

আন্তর্জাতিক সহায়তা নেওয়ার ক্ষেত্রে শর্তগুলো সতর্কতার সঙ্গে মূল্যায়ন করতে হবে, যাতে তা দেশের সার্বভৌমত্ব বা উন্নয়ন পরিকল্পনা (যেমন- নবায়নযোগ্য জ্বালানি বনাম কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র) বাধাগ্রস্ত না করে। একক উৎসের ওপর নির্ভর না করে বহুমুখী অর্থায়নের উৎস (যেমন- GCF, বিশ্বব্যাংক, এডিবি) ব্যবহার করা উচিত। তদুপরি, দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা এবং সমমনা ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর (CVF-Climate Vulnerable Forum) সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে দরকষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

(গ) বৈশ্বিক অংশীদারিত্বে জাতীয় স্বার্থ ও সীমাবদ্ধতা বিবেচনা:

বাংলাদেশকে 'সবাইকে নিয়ে, কিন্তু নিজের শর্তে' নীতি অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ জলবায়ু অর্থায়নকে দান হিসেবে না দেখে উন্নত বিশ্বের ঐতিহাসিক দায়িত্ব (Climate Justice) হিসেবে তুলে ধরতে হবে। নিজস্ব প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে জ্ঞান-ভিত্তিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রযুক্তি স্থানান্তর (Technology Transfer) এবং দেশের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে মনোযোগ দিতে হবে।

(ঘ) অর্থায়ন ও শর্তযুক্ত সহায়তায় নীতি বাস্তবায়ন ও নিরীক্ষা:

সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP) এবং বাজেট কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প প্রস্তাব করতে হবে। আন্তর্জাতিক তহবিলের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে স্বাধীন অডিট ফার্ম বা সরকারি নিরীক্ষা বিভাগ ব্যবহার করে নিয়মিত নিরীক্ষা করা উচিত। শর্তযুক্ত সহায়তার ক্ষেত্রে 'গ্রিন বন্ড' বা সহজ শর্তের ঋণ বিকল্প খুঁজে বের করা এবং উন্নয়ন পার্টনারদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শর্ত শিথিল করার প্রচেষ্টা করা যেতে পারে।

(ঙ) বৈশ্বিক নীতি ও স্থানীয় জনগণের চাহিদার ভারসাম্য:

'লোকাল লেড অ্যাডাপটেশন' বা স্থানীয় নেতৃত্বাধীন অভিযোজন কৌশলকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এতে স্থানীয় মানুষের প্রয়োজন ও জ্ঞানকে কেন্দ্রীয়ভাবে বিবেচনা করা হয়। আন্তর্জাতিক জলবায়ু নীতি বাস্তবায়নের সময় কৃষকদের লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ফসলের বীজ প্রদান, নারীদের স্বাবলম্বী করা এবং উপকূলীয় অঞ্চলে সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণের মতো টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। এভাবে জলবায়ু তহবিলের অর্থ প্রকৃত ভুক্তভোগীদের কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করা যায়, যা স্থানীয় সরকার ও এনজিওগুলোর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

© CrackTech
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কপিরাইট আইন দ্বারা সংরক্ষিত।
Live Written™ অ্যাপ, সাইট কিংবা লেকচার কোন অংশ নকল করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।